দৈনিক সংবাদ 02

তারিখ ... 14 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

20

গণশিক্ষা কার্যক্রমঃ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যত কর্মসূচী

প্রফেসর এস এম সাইফউদ্দীন
নির্বাহী পরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম

নিরক্ষরতা আর দরিদ্রতার মানচিত্র একই। নিরক্ষরেরা এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড এই নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্যই ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমান সমাজ কাঠামোয় যারা বিত্তবান এবং যারা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী তারাই সমাজের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। অন্যদিকে যারা দরিদ্র এবং নিরক্ষর তারা সমাজের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই নিরক্ষর এবং তারা কোনদিনই কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়নি। ফলে তারাই সমাজে সকল হতাশা এবং বঞ্চনার শিকার।

গণশিক্ষার উদ্দেশ্য কি? শুধুই কি নিরক্ষরতা দূরীকরণ? এটি একটা কারণ হতে পারে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের বিপুল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করা। দেশের বিরাজমান আর্থ-

(১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

গণশিক্ষা কার্যক্রম

(২য় পৃষ্ঠার পর)

সামাজিক উন্নয়ন গতিধারার মধ্যে এই নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।

অতীতে কিছু কিছু খন্ডিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এসব উদ্যোগ সার্বিকভাবে সমন্বিত না হওয়ায় জাতীয় জীবন থেকে নিরক্ষরতা দূর তো হয়নি বরং নিরক্ষরের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০ সনে প্রথমবারের মত চিন্তা ভাবনা করে গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। এই গণশিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। দুঃখের বিষয় সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই জনপ্রিয় কর্মসূচীটি বাতিল করা হয়। ১৯৮২-১৯৮৭ পর্যন্ত দেশে সরকারীভাবে কোন গণশিক্ষা কর্মসূচী গৃহীত হয়নি।

১৯৮৭ সনে পুনরায় গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়। কিন্তু গৃহীত পদক্ষেপ দু'টি কৌশলগত ত্রুটির কারণে অভীষ্ট ফল লাভ করতে পারেনি- (ক) গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সমান্তরালভাবে জোরদার করা হয়নি ও (খ) সরকারের রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়াযায়নি।

৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় এবং বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে গণশিক্ষা কার্যক্রম (বর্তমানে উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম)-কে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিমূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গণশিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্তির জন্য জনগণকে বয়স অনুসারে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ (ক) প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে (৪-৫ বৎসর বয়সী), (খ) মৌলিক শিক্ষা (৬-১০ বৎসর বয়সী), (গ) কিশোর-কিশোরী পর্যায় (১১-১৪ বৎসর বয়সী), (ঘ) বয়স্ক শিক্ষা (১৫-৩৫ বৎসর বয়সী), এবং (ঙ) অবিরাম শিক্ষা গ্রহণ। উপরোক্ত সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাপোকরণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

কার্যক্রমের লক্ষ্যঃ

৪-৫ বছর বয়েসী শিশুদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং বিদ্যালয় গমনের অভ্যাস গড়ে তোলা। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয় সংলগ্ন শিক্ষায়তন সমূহ এবং বিভিন্ন সমাজিক/সংগঠন কেন্দ্রে গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

-১৯৯৩ সালের মধ্যে ৩০০০ টি শিক্ষা কেন্দ্রে ৯০,০০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কমপক্ষে ৫০% বালিকা শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হবে।

-১৯৯৩ সালের মধ্যে ৩ হাজার শিক্ষাদান কেন্দ্রে ৯০,০০০ কিশোর/কিশোরীদের লাভজনক কাজে/পেশায় লিপ্ত হওয়ার প্রাক-প্রভৃতি অর্জনে সহায়তা প্রদান এবং বয়স্ক নিরক্ষর হওয়া বিরত রাখা।

-১৯৯৪ সালের জুন মাসের মধ্যে ২,৭৬০ টি সরকারী বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে মোট ২,০০,৪০০ বয়স্ক ব্যক্তিকে এবং বেসরকারী সংস্থা সমূহের মাধ্যমে ৩,০০,০০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হবে এবং লব্ধ শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে জীবনব্যাপী শিক্ষাদান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হবে। দেশের মোট ৬৯টি থানায় ১০টি করে জীবনব্যাপী শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হবে।

বেসরকারী সংস্থাসমূহ সরকারী পর্যায়ে কার্যরত ৪৩টি থানার অতিরিক্ত ১০০টি থানায় ২,০৪৬ টি কেন্দ্রে ৫৬,৩৯৫ জন তালিকাভূক্ত শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এ দপ্তরের উদ্যোগে এবং এনজিওদের মাধ্যমে খুব শীঘ্রই মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে আরম্ভ করার প্রস্তুতিমূলক কার্যাদি শুরু হবে।

বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার বিদ্যমান থাকায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার মত একটি অনুকূল পরিবেশ দেশে বিরাজমান। গণশিক্ষা কার্যক্রমের পরিধি ব্যাপক এবং এর উপাদানসমূহ জটিলতাপূর্ণ। বাস্তবায়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, এটি একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। এর জন্য প্রয়োজন গণজাগরণ ও গণমানুষের সম্পৃক্ততা এবং সাথে সাথে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক জবাবদিহিমূলকব্যবস্থা।